আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে

মেজর (আবঃ) এম এ জলিল

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

মেজর (অব.) এম এ জলিল

প্রকাশনী

সত্য প্রকাশ

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

মেজর (অব.) এম এ জলিল

উৎসর্গ	:	স্বৈরাচার বিরোধী চেতনা এবং আত্মাহুতির প্রতি, "আত্মপরিচয়ের সন্ধানে" গ্রন্থটি তাঁদের জন্য-
গ্রন্থস্বত্ব	:	গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশক	:	সত্য প্রকাশ, ঢাকা।
প্রকাশকাল	:	১৯৮৯ সাল।
মূল্য	:	৩০০ টাকা মাত্র।

লেখক 'মেজর জলিল' প্রয়াত হওয়ায় এবং ওনার উত্তরাধিকারগনের সঙ্গে যোগাযোগের কোন মাধ্যম না পাওয়ায়, বিপ্লবী চেতনা থেকে পাঠকদের কাছে অজানা ইতিহাস পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বইখানা সত্য প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত হল। বইটি যদি কখনো লেখকের উত্তরাধিকারগনের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বইয়ের স্বত্ব নিয়ে দাবি থাকে তাহলে অবশ্যই সত্য প্রকাশের মেইল কিংবা ওয়েবসাইটে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের দায় দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

Sottoprokash.com
sottoprokash36july@gmail.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪

সূচনা ৬

মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ৮

মৌলিক সত্যের বিচ্যুতি ৯

একনজরে বাংলাদেশের জনগণ ও রাজনীতি ১০

আমলাতন্ত্রের ফাঁদে ওলামা সমাজ ১৯

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র: মূল সমস্যাসমূহ ২২

ওলামাদের নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলন অপরিহার্য ২৩

বাংলাদেশে পরিচিতি সংকট ২৪

অর্থনৈতিক নিপীড়ন ২৫

কৌশল ২৬

একটি ইসলামি বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি আবশ্যক ২৮

উপসংহার ২৯

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতাআলা আমাকে ১৯৭১ সালের একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের আজকের এই ক্রান্তিকাল প্রত্যক্ষ করার তৌফিক দিয়েছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের অল্প কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে মাত্র, আমি গ্রেফতার হলাম ভারতীয় বাহিনীর হাতে, যারা এদেশে এসেছে মিত্রশক্তি হিসেবে। নিজে যুদ্ধ করে অর্জিত আমার স্বাধীন মাটিতে আমি হলাম প্রথম রাজনৈতিক বন্দি। আমার অপরাধ ছিল এই যে, আমি আমার দেশের জাতীয় খনিজ এবং মূল্যবান সম্পদ লুটপাটে ভারতীয় সৈন্যদেরকে বাধা দিয়েছিলাম। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার স্বাদ আমাকে এভাবেই পেতে হলো।

তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে আমার বিচারের জন্য একটি বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হলো। কিন্তু আল্লাহতাআলার অশেষ রহমতে আমি সসম্মানে ও সমর্যাদায় বেকসুর মুক্তি পেলাম। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করার সময়ে আমার একটা দুর্লভ সম্মান ছিল এখান থেকে মাত্র একদিনেরও কোনো সেবা গ্রহণ করা কিংবা জনগণের জন্য কাজ করার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তিগত মুনাফা না নেয়ার জন্য।

একান্তভাবে আমার যা উপলব্ধি হলো, তাতে আমি বুঝলাম, স্বাধীনতার নামে আমরা যা অর্জন করেছি, তা ভারতীয় বশ্যতার শিকার হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমি আমাদের সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে ভারতীয় কর্তৃত্বের বিপক্ষে একটি প্রতিরোধ শক্তি দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সেই সংকটময় ক্রান্তিকালে তখন একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এটাকেই আমি সবচেয়ে যথার্থ পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করেছি। সাধারণ জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষাও ছিল আমাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সুরক্ষার অনুকূলে এবং সে কারণে আমি যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তা জনগণের কাছ থেকে বিস্ময়কর সাড়া পেল এবং দ্রুত এই প্রতিরোধ-আন্দোলন দেশের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দলে রূপ নিল। এটা ছিল একটি সামাজিক গণতান্ত্রিক দল, যেহেতু তখন দেশে কোনো ইসলামি দলের কার্যক্রম অনুমোদিত ছিল না, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির একটি হিসেবে আরোপ করেছে। অন্য তিনটি হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। দীর্ঘ ১৩ বছর আমাকে এই পথ ধরে আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হয়েছে। একপর্যায়ে আমি আমার দেশের জনগণের জন্য ভারতীয় আগ্রাসনসহ যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠলাম এবং লক্ষজনতা, বিশেষ করে দেশের যুবসমাজের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা থেকে আমি আমার সেসব সাধারণ মানুষের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আরো বেশি কাছাকাছি চলে আসি, যারা গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ। আমার জীবনটা সার্বক্ষণিকভাবে সত্য এবং মুক্তিসন্ধানী। সুতরাং স্ববিরোধী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কোনো পন্থা আমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেনি। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সত্য ও মুক্তির অদম্য স্পৃহা আমাকে ক্রমশ নবতর অন্বেষণে অবতীর্ণ হওয়ার তাগিদ দিতে থাকে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নাম নিয়ে এটা আমার অকপট স্বীকারোক্তি যে, আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি আমাদের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করার সদিচ্ছা থেকে। এটা নিশ্চিতভাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা কোনো রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তিকে হেয়, ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস ছিল না। আমি তাই বলেছি, আমাদের দেশ ও সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে যেমনটি পর্যবেক্ষণ করেছি। হাজার হাজার তরুণ-যুবক, যারা আমার সাথে দীর্ঘ ১৩ বছর কাজ করেছে এবং যারা প্রিয় দেশের জন্য আমার কাজকে পর্যবেক্ষণ করেছে, তাদের প্রতি আমি সবিনয় অনুরোধ রাখতে চাই যে, তারা এই লেখাটি পড়বে সংস্কারমুক্ত ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টি দিয়ে এবং খোলামনে এটির উপজীব্য গ্রহণ করবে এবং তাদের চেতনা ও উদ্দীপনাকে শাণিত করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করবেন, সাহস জোগাবেন সত্যকে গ্রহণ করতে, সত্যকে ধারণ করতে এবং সত্যকে টিকিয়ে রাখতে। আমি আমার বন্ধু, সহকর্মী এবং দেশ-বিদেশের শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা মূলত আমার এই কথাগুলো সন্নিবেশিত করতে সাহায্য করেছেন। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আমি আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের কাছে মাথানত করি আমাকে সত্য উচ্চারণে সাহস দেয়ার জন্য।

মেজর এম এ জলিল।

সূচনা

আজকের বিশ্বসভ্যতায় প্রাজ্ঞ ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রবল সংকট মানবজাতির জন্য একটা গভীর অশনি সংকেত। ইতিহাসের জড়বাদী তত্ত্ব নেতৃত্ব বিকাশের নামে তৈরি করেছে চূড়ান্ত যান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, বর্বর এবং অন্তঃসারশূন্য আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব। কচিৎ বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নসমৃদ্ধ নেতৃত্ব দেখা যেতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনাবর্জিত নেতৃত্ব মানবসভ্যতার শান্তি-সৌহার্দময় বিকাশের জন্য উপকারী ও ইতিবাচক অগ্রগতির স্থলে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব জাতির সর্বাপেক্ষা অনুকূল পর্যায়ে তাদের ধ্বংসাত্মক মেধা ও শক্তি গ্রথিত করেছে, কিন্তু হারিয়েছে বিবেকের সংবেদন, দায়িত্বশীলতা এবং মূল্যবোধ। মানবিক মূল্যবোধবর্জিত নেতৃত্ব আত্মঘাতী এবং ক্রমশ আজ সমগ্র সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক, বাস্তবিক অর্থে তা এক সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডে রূপ নিয়েছে। অপরিণামদর্শী, অনৈতিকতা ও পৈশাচিকতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আধুনিক নেতৃত্বে কেবল শয়তানি জীবনাচারের জন্ম দিয়েছে। যা কেবল পবিত্র কুরআন নিঃসৃত ঐশী সত্যকে আঁকড়ে ধরা মানবজাতির মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে স্বার্থোদ্ধার করতে পারে। প্রচলিত এ পদ্ধতির শিকার সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে আমার দেশের জনগণের একজন, বিবেকের হাতে বন্দি এই আমি প্রামাণ্য দলিল তৈরির দায়িত্বভার নিয়েছি দেশের মানুষের প্রতি আমার প্রবল দায়িত্ববোধ থেকে। আমার এই যৎসামান্য প্রয়াস হয়তো আমার দেশের অনাগত প্রজন্মকে আমাদের সীমাবদ্ধতা এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করবে। আমি নিশ্চিত এবং আন্তরিকভাবে তাদের ঘাড়ে আমাদের বর্ধমান অপরাধ ও পাপের বোঝা চাপাতে চাইব না, আর এটাও নয় যে, আমি আমার দৃষ্টি বন্ধ করে রাখতে এবং অনাগত প্রজন্মের কাছে নিজেকে গুটিয়ে রাখার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করব। একজন মুসলমান হিসেবে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে নিশ্চিত বিজয়ের প্রত্যাশা অথবা জীবন উৎসর্গের শপথ নিয়ে বর্তমানের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং যেকোনো ঝুঁকি নিয়ে সকল অসংগতির বিরুদ্ধে লড়াই করা আমার পবিত্র দায়িত্ব। এই লেখা আমার নিজের, সহযোদ্ধাদের, শুভাকাঙ্ক্ষীদের এবং আমার প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, আমাদের

অভিযান পূরণে ব্যর্থতা এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে একটা সতর্কতা উচ্চারণের প্রয়াস।

স্বভাবগতভাবে মহান সৃষ্টিকর্তা, নিজস্ব ভূখণ্ড, পিতামাতা, সহযোদ্ধা, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের পূর্বসূরিদের প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞতা সীমাহীন, অপরিমেয়। অনাগত প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্বও কিন্তু তেমনি সীমাহীন। কিন্তু আমাদের ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য দুঃখজনকভাবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু, কোনো পরিস্থিতিই আমাদের এই অক্ষমতাকে অতিক্রম করাতে পারে না।

আমরা যদি আমাদের অকৃতজ্ঞতাকে উপলব্ধি ও স্বীকার করতে না পারি, তাহলে আমাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার বিষয়টি ও মূল্যায়ন করতে পারব না। আমাদের বিদ্যমান এই সীমাবদ্ধতাসহ আল্লাহু কারীমের প্রতি অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই মহান সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টির জন্য সবকিছু উৎসর্গ করার প্রস্তুতি ঘোষণা করতে হবে এবং এই আমার উপলব্ধির সাথে যদি আমার সহযোদ্ধা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও আমার দেশের মানুষ একাত্ম হয়, তাহলে সেটাকে আমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অশেষ রহমত বলে মনে করব।

মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমিকা

অনিবার্য মরণশীলতায় আবদ্ধ ক্ষণজন্মা, ক্ষুদ্র পরিসর এই মানবজীবন দুনিয়ায় সুনির্দিষ্ট একটি ভূমিকা পালনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতাআয়ালা কোনো উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন ছাড়া কিছুই সৃষ্টি করেননি এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষেরই রয়েছে ইতিবাচক ও সৃষ্টিশীল ভূমিকার বিশেষ দায়িত্ব। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মানবজাতিকে সে কারণেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি সবচেয়ে বেশি বিনয়ী ও অনুগত হতে হবে এবং তাদের সহকর্মীদের প্রতি। পারস্পরিক আচার-আচরণে হতে হবে দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল। পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানুষকে নিজের অমিত সম্ভাবনা ও কর্মক্ষমতা নিয়ে সংগ্রাম করে জীবনের সবচেয়ে অনুকূল পর্যায় পর্যন্ত তার যোগ্যতা ও গুণাবলিকে উন্নীতকরণের কাজে তৎপর থাকতে হবে। উপরন্তু তাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পবিত্র কুরআনকে পথিকৃৎ হিসেবে নিয়ে জীবনের। যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের নিজেদের স্বার্থেই নির্ভুল ও ভুলের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখাও অঙ্কন করে দিয়েছেন আর আমরা মানবজাতি হিসেবে সকল প্রকার শয়তানি ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ পরিহার করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে চলার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। শুধু তাই নয়, আপসহীন জিহাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের ইমান রক্ষা এবং সকল শয়তানকে ধ্বংস করার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো শান্তির অগ্রগতি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যেকোনো মূল্যে সত্যকে ধারণ এবং মিথ্যাকে হয়, যাতে দুনিয়ার সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হতে পারে। উপরন্তু এই জীবনব্যবস্থা পরকালীন জীবনের সুফল লাভের পথ রচনা করবে। কিন্তু প্রকৃত মৌলিক সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অথবা জেনেশুনে এই নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দুঃসহ দুঃখ-যাতনা, ক্লেশ এবং অনতিক্রম্য দুর্গতি।

আজকে মানবজাতির অনেক ক্ষেত্রে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকেই যেন তথাকথিত উদ্ভাবনা নিয়েও আধুনিক সভ্যতা বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশের

অধিক জনগোষ্ঠীকে এখনো ক্ষুধা এবং অভিশপ্ত দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণায় নিমজ্জিত রেখেছে। মৌলিক সত্যকে পাশ কাটিয়ে মানুষ আত্মহারা হয়ে এসব কথিত দর্শনের মাধ্যমে শান্তি, অগ্রগতি ও সুখের সন্ধান করে চলেছে এবং অগ্রগতির এই উন্মত্ত ও আতঙ্কজনক ধারা, আধুনিক সভ্যতার এমন পরিণতি কোটি কোটি মানুষের জীবনে একের পর এক দুর্যোগ ও দুর্ভোগ বয়ে আনছে। ফলে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে গিনিপিগ বা ইতর প্রাণীর মতো ।

নানাবিধ সংকীর্ণ পথ, দর্শন এবং ইজম বা মতবাদ কেবল তাদের অন্তহীন অন্তঃসারশূন্যতারই উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের দিকনির্দেশনা থেকে বিচ্যুতি মানবজাতিকে ক্রমশ ঘোর অমানিশার অতল গহবরে নিক্ষেপ করছে। মৌলিক সত্যের অনুপস্থিতিতে মানবজাতি আজ জীবনের সকল মহৎ মূল্যায়ন এবং গুণাবলির বিপরীতে অবস্থান করছে।

মৌলিক সত্যের বিচ্যুতি

মৌলিক সত্য থেকে বিচ্যুতির ঘটনা ইহুদি এবং রাজতন্ত্রে ধারক-বাহকদের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইসলামে রাজতন্ত্রের কোনো স্থান নেই, তবে এর ধারণাটা বিদ্যমান রয়েছে; আজ আমরা দেখতে পাই, বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশে এই রাজতন্ত্র চলছে। এটা পবিত্র কুরআনের বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটা একটা স্পর্ধা, এটা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের একটা ষড়যন্ত্র। ইসলামের মাহাত্ম্যের ওপর এটা একটা অশুভ কলঙ্কস্বরূপ। পবিত্র কুরআনকে ব্যাখ্যা করতে হবে অবশ্যই যথার্থ বা সঠিক পন্থায়। কিন্তু, মানবজাতি কুরআনসম্মত জীবন বিধান অনুসরণ না করে বস্তুতপক্ষে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্র থেকে তাকে মুছে ফেলেছে; যার ফলে তারা পৌঁছে গিয়েছে পশুর স্তরে। এই অধঃগতি আল্লাহর নির্দেশিত জীবন থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসারই শাস্তিস্বরূপ। মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা ছিল পবিত্র কুরআনের আদর্শভিত্তিক। ইতিহাস ঐ সময়কার মুসলমানদের অর্জিত বিস্ময়কর সাফল্যগুলোকে

ততোটাই ধারণ করেছে, যতটা তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নীতি আদর্শে অবিচল থেকেছেন। ইতিহাস অবশ্য চার খলিফা-পরবর্তী সময়কার মুসলমানদের জীবনে ইসলামের বিকৃতি ও বিচ্যুতির ঘটনাও ধারণ করেছে এবং সেখান থেকেই এই বিচ্যুতি মুসলমানদের লক্ষ্যভ্রষ্ট ভিত্তিমূল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকে। আজকে মানবজাতি, বিশেষ করে মুসলমানরা একটা হালবিহীন (বা পরিত্যক্ত) জাহাজের মতোই অসহায়। আত্মপরিচয়, স্বীয় অস্তিত্ব অর্জন এবং পাপ থেকে পরিত্রাণের অন্বেষা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ঐতিহাসিকভাবেই প্রয়োজনীয়। এবার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের দিকে নজর দেয়া যাক।

একনজরে বাংলাদেশের জনগণ ও রাজনীতি

(ক) রাষ্ট্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। সকল ধর্মীয়, রাজনৈতিক দল এবং তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী অনুসারীরা তথা সমগ্র জাতি এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়। একটাই লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা; যে চেতনা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। অথচ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠন করলেন একমাত্র তাঁর দলকে নিয়ে এবং তিনি ব্যর্থ হলেন একটি জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করতে। শেখ মুজিবের এমন আচরণ হতাশ করল। দেশের মানুষকে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে, স্বভাবতই দেশের সর্বস্তরের মানুষ, যারা আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তারা জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারল না এবং তারা স্ব-স্ব সামাজিক অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করল ।

আজকের এই সংকটের বীজ বপন করেছিলেন শেখ মুজিব নিজেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। তিনটি পূর্বতন সরকার যথাক্রমে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার (জানুয়ারি ১৯৭২-১৫ অগাস্ট, ১৯৭৫), জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের বিএনপি সরকার (৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ ৩০ মে, ১৯৮১) এবং জেনারেল এরশাদের বর্তমান সরকার (২৪ মার্চ ১৯৮২ সালে ক্ষমতাসীন) ব্যর্থ হয়েছে জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং

সাংস্কৃতিক সমস্যাবলি অনুধাবন করতে। সবক'টি সরকারই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় ঐক্য সংহত রাখতে। আইনের শাসন এবং জাতীয় স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ এই মুহূর্তে অতীব জরুরি প্রয়োজন, কেননা দেশের অস্তিত্ব আজ শোচনীয় পরিণতির মুখোমুখি। আমাদের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধির সুযোগে প্রতিবেশী ভারতের আগ্রাসন আমাদেরকে মারাত্মকভাবে গ্রাস করছে। সর্বস্তরের মানুষ একটা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বোধ করছে এবং বর্তমান সরকারের কর্মক্ষমতা ও আন্তরিকতার ওপর তাদের কোনো আস্থা অবশিষ্ট নেই। এমনকি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল কর্মচারীই সরকারের সমালোচনা করছে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও স্বাধীন চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সকল পেশাজীবী মানুষ হয়ে উঠেছে ভিক্ষুক। এই মুহূর্তে সাধারণ জনগণের মধ্যে এমন একটা উপলব্ধি জন্মেছে যে, বর্তমানে দেশের কোনো জাতীয় পরিচয় নেই। নৈরাজ্য আজ আমাদের অস্তিত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সুতরাং, বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য।

(খ) ভূখণ্ড এবং জনগোষ্ঠী ও ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এক পাললিক ভূখণ্ড বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই শতাধিক মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে ধারণ করেছে। এখানে শতকরা পঁচাশি ভাগেরও বেশি মানুষ বাস করে গ্রামে এবং প্রাথমিকভাবে তারা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আর আমাদের জনগণের কৃষিক্ষেত্র নির্ভরশীল ধর্মের ওপর। এখানে সমগ্র জনগোষ্ঠীর শতকরা নব্বই ভাগ ইসলাম ধর্মের অনুসারী আর বাকি দশ ভাগ মাত্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান। ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান চলে আসছে এখানে স্মরণাতীতকাল থেকে। স্বভাবতই এখানকার মানুষ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, শান্তিপ্রিয় এবং অতিথিপরায়ণ।

এদেশে ইসলামের অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল এবং এটা সম্ভবত বৃহত্তম প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের অবস্থানের কারণেই হতে পারে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে মূলত একটি হিন্দুরাষ্ট্র বিদ্যমান রয়েছে। সেখানকার মুসলমানরা এই হিন্দুত্ববাদের ফলে একটা সহজাত আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে, যেহেতু তারা উগ্রপন্থি হিন্দু এবং সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্মরণাতীতকাল থেকে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে

আসছে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের আতঙ্কের দিশেহারা শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা অনেক সময়ে আশ্রয় নিতে চায় আমাদের বাংলাদেশে।

(গ) প্রশাসনিক কাঠামো ও ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদমুক্ত হয় ১৯৪৭ সালে অগাস্ট মাসে। পাকিস্তানে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী প্রশাসনিক পদ্ধতি অব্যাহত থাকে এবং তারা তাদের পঁচিশ বছরের শাসনকালে এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। এই শাসনব্যবস্থার ওপর জনগণের আর কোনো সহানুভূতি নেই। এর অকার্যকারিতা এবং অসারতা আজ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত। পাকিস্তানি শাসকরা ইসলামকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইসলামি শাসনব্যবস্থার জন্য কোনো আন্তরিকতা প্রদর্শন করেননি। বর্তমানে সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টরা উঠেপড়ে লেগেছে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, যে মুহূর্তে ইসলামি শক্তিগুলো সংগ্রাম করছে কুরআনি শাসনের জন্য। সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সরাসরি বিদেশি শক্তির মদদপুষ্ট এবং তারা ইসলামি শক্তিগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত। সুতরাং আমাদের সাংস্কৃতিক ও চেতনাগত ঐতিহ্যের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার আলোকে প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন জরুরি ভিত্তিতে আবশ্যক।

(ঘ) সামাজিক আমলাতন্ত্র: জনগণ আজ উপনিবেশবাদী প্রশাসনব্যবস্থার ওপর বীতশ্রদ্ধ। ভুক্তভোগী জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে শাসক পরম্পরায় অভিন্ন উন্নাসিক আচরণ এবং নৈরাজ্যকর বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আমলাতন্ত্রের লাগামহীন দুর্নীতি জনসাধারণকে আমলা তথা শাসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এখানকার সামাজিক আমলাতন্ত্র সামরিক আমলাতন্ত্রের যোগসাজশে দমনপীড়ন নীতির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করে আসছে।

(ঙ) সামরিক আমলাতন্ত্র: এটাও এখন একটা ঘৃণিত বিষয়, যেহেতু ১৯৫৮ সাল থেকে জনগণ অনেকগুলো সেনাঅভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। সামরিক শাসন কেবল জনগণের দুর্দশাকেই আরো শোচনীয় করে তোলে, এ যাবতকালে কোনো সমস্যার সমাধান তাদের শাসনে পাওয়া যায়নি। সামরিক শাসন বহুমুখী দুর্নীতির প্রসার ঘটায় এবং জনগণ তাদের প্রিয় সেনাবাহিনীর ওপর শ্রদ্ধা হারায়। সামরিক শাসকরা বর্ণচোরা ও দুর্বৃত্তশ্রেণির অসৎ রাজনীতিকদেরকেই পুনর্বাসিত করেছে কেবল ক্ষমতার

খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। স্বাধীনতার পর এই দেশটি সামরিক অভ্যুত্থান দেখেছে ১৫ অগাস্ট ১৯৭৫, ৩ নভেম্বর ১৯৭৫, সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, ১৭ জুন ১৯৭৬, ২ অক্টোবর, ১৯৭৬, ৩০ মে ১৯৮০ এবং সর্বশেষ ২৪ মার্চ ১৯৮২। অন্যদিকে বহু ব্যর্থ অভ্যুত্থানও হয়েছে। শত শত সৈন্য এবং বহু অফিসার ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে, অনেকে হয়েছে কর্মচ্যুত। অসন্তোষ ও হানাহানি বেড়েই চলেছে সেনাবাহিনীতে। সামরিক বাহিনী স্বভাবত ইন্দোসোভিয়েত লবীবিরোধী মনোভাবাপন্ন, আর প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনেকে আবার এই লবীর অনুসারী। সৈন্যরা সাধারণত ইসলামি ভাবাপন্ন। সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের এখনো একটা আগ্রহ বা মোহ রয়েছে; যেহেতু বিকল্প কোনো স্থিতিশীল নেতৃত্ব তাদের কাছে দৃশ্যমান নয়।

(চ) পুলিশ বাহিনীঃ এই বাহিনীর কোনো সুনাম, খ্যাতি, প্রশংসা নেই। তাদের দুর্নীতি এবং অকার্যকর ভূমিকার কারণে। তারা অসামাজিক কার্যকলাপ দমন ও নিয়ন্ত্রণে তাদের ব্যর্থতাকেই বাড়িয়ে চলেছে। এই বাহিনীর আধুনিকায়ন করে একে বর্ণাঢ্যভাবে সজ্জিত করা হয়েছে রাজনৈতিক 'সহিংসতা' (বিক্ষোভ) দমনের উদ্দেশ্যে এটা একটা দমনপীড়নমূলক বাহিনীতে রূপ নিয়েছে।

(ছ) গ্রামপ্রতিরক্ষা দল: এটি আধাসামরিক বাহিনীর একটি শাখা। এ বাহিনী একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে, যদি যথার্থভাবে পরিচালিত হয়। দেশের আটষট্টি হাজার গ্রামেই এ বাহিনীর কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। সর্বমোট সংখ্যায় এরা আধা মিলিয়নেরও বেশি।

(জ) সীমান্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী: এটি পরিচালিত হয় একজন মেজর জেনারেলের নির্দেশনায়। বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস) নামে পরিচিত এ বাহিনী এখনো পর্যন্ত এর যথার্থ উপযোগিতা বা কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারেনি। কিন্তু এ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ বাহিনী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী দুই হাজার একশ (২১০০) মাইল এলাকা জুড়ে দায়িত্বরত রয়েছে। ভারত উদ্দেশ্যমূলকভাবে সীমান্তে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং প্রায়শই তার বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) দিয়ে আমাদের বিডিআর সদস্যদেরকে হত্যা করে ।

(ঝ) ছাত্রসমাজ (শিক্ষাক্ষেত্র): এদেশের ছাত্রসমাজ সবসময়েই যুদ্ধংদেহী। ইন্দো-সোভিয়েত লবি সর্বদা এদের ওপর একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। এরা যেকোনো সামান্য ইস্যুতে স্বল্প নোটিসে প্রাণোচ্ছল শক্তি নিয়ে বিক্ষুব্ধ, মারমুখী রূপ দিতে সদা প্রস্তুত। তবে অনেক সময়ে হতাশাই এদের জন্য প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। সরকারের স্থিতিশীলতা অনেকাংশে এদের মনোভাবের ওপরেই নির্ভরশীল। সাধারণত আমাদের ছাত্রসমাজ দেশপ্রেমিক, তবে বর্তমানে এদের বৃহদংশই বিদেশি শক্তির মদদপুষ্ট কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। ছাত্রসমাজ এখন যত্রতত্র রক্তক্ষরণ করছে আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে।

(ঞ) শ্রমশক্তি: সাধারণত নগর বা নগরকেন্দ্রিক এলাকায় কার্যরত আধা সংগঠিত এক শ্রমিকশ্রেণি বিদ্যমান। এদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায় থেকে আগত। শ্রমিকদের রাজনৈতিক ভূমিকা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য সাধারণ বাম সংগঠনগুলো শ্রমিকদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো নৌপথ, রেলপথ, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, ইস্যুরেন্স, পরিবহণ, বেসামরিক বিমানসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক- কর্মচারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ সেক্টর এবং কমিউনিস্টরা এর মাধ্যমে তাদের ইচ্ছানুযায়ী সরকারকে অচল করে দেয়ার মতো শক্তি নিয়ে অবস্থান করতে চায়।

(ট) কৃষক সম্প্রদায়: শতকরা পঁচাশি (৮৫%) ভাগেরও বেশি লোক এ সম্প্রদায়ভুক্ত। ধনিক শ্রেণি এবং অদৃশ্যমান ভূম্যধিকারীর সংখ্যা এদেশে নিতান্তই নগণ্য। এদের প্রায় সকলেই গ্রামত্যাগী এবং এরা নগর এলাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই কিন্তু চলেছে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই কম, তাদের ধর্মীয় অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। আল্লাহভীতি এবং সাধারণ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই কৃষকরা ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলনের এক শক্ত ভিত রচনা করতে পারে। কিন্তু কমিউনিস্টরা দারিদ্র্য বিমোচনের প্রলোভন দিয়ে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(ঠ) অর্থনীতি: আমাদের দেশটি এখনো একটি সামন্তবাদী ধারার উন্নয়নশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশ। এখানকার অর্থনীতি মূলত পেটিবুর্জোয়া ধরনের। বাণিজ্যিক পুঁজিও এখানে অপ্রতুল নয়। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আকস্মিকভাবে সকল শিল্পকারখানা জাতীয়করণের ফলে অর্থনীতিতে প্রতিকূল প্রভাব দেখা দেয়। এছাড়া অদক্ষতা, অনান্তরিকতা, দুর্নীতি এবং অসদাচরণ অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছে। শিল্পকারখানার বিরাষ্ট্রীকরণের। (ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর নিশ্চিত সুফল অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো, তবে আকস্মিক বিরাষ্ট্রীকরণ প্রধানত নব্য অসৎ ধনিক শ্রেণিকেই লাভবান করে। সব মিলিয়ে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি একটা বিশৃঙ্খলাবস্থার মধ্যে নিপতিত। ভারতীয় স্বার্থবাদী বণিক শ্রেণির সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের অর্থনীতির ওপর নির্মম লুণ্ঠনযজ্ঞ চালিয়ে আসছে।

(ড) সংস্কৃতি: আমাদের দেশে প্রধানত চারটি ধর্মীয় মূল্যবোধ যুগপৎ লালিত হয়ে আসছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা এখানে দীর্ঘকাল ধরে সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করছে। এদেশের জনগণ একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে তুলেছে এবং যথাসম্ভব তাকে লালন-পালনও করে আসছে। তাদের আল্লাহভীতি তাদেরকে তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির ব্যাপারে আপসকামী হতে দেয় না। আমাদের জনগণ সংগীত, নৃত্য, নাটক এবং উৎসব ইত্যাদি উপভোগ করে। ইসলামি সংস্কৃতি আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও হিন্দুশাসিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে আক্রান্ত হয়ে অপব্যাখ্যা, অপপ্রচারে ঢাকা পড়ে আছে।

(ঢ) রাজনীতি: বিদেশি হানাহার বাহিনী এবং ঔপনিবেশিক শক্তির অব্যাহত অভিযান ও আক্রমণই আমাদের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির মূল কারণ। আমাদের জনগণ স্বভাবতই রাজনৈতিক তারা রাজনীতি ভালোবাসে; রাজনীতিবিদদেরকে ঘৃণা করে। আর এটাই তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজনীতির ব্যর্থ হওয়ার কারণও বটে। আমাদের জনগণ স্বভাবত ডানপন্থি রাজনীতিকে স্বাগত জানিয়ে থাকে। তবে তরুণ সমাজকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাম রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়তে দেখা গেছে। গণতান্ত্রিক দলগুলো প্রায় সবসময়েই জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা ধরে রাখতে না পেরে তাদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা কুড়িয়েছে।

এখানে কোনো যথার্থ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নেই। আর এ শূন্যতা থেকেই বিপরীতধর্মী ক্ষতিকারক রাজনীতি শিকড় বিস্তৃত হয়েছে। ইসলামভিত্তিক রাজনীতির একটা ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ ইতোমধ্যেই সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য ইজমপ্রসূত পশ্চিমা গণতন্ত্রের রাজনীতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তরুণ সমাজও আজ একটি ইসলামি বিপ্লবের সন্ধান করে ফিরছে। চলমান বা প্রচলিত ঐসব রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা সর্বাগ্রে বিভ্রান্ত করেছে এ তরুণ সমাজকে।

(ণ) রাজনৈতিক দল: আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল রয়েছে ছয় ডজনেরও বেশি। এগুলোর প্রায় সবগুলোই রূপান্তরিত হয়েছে একেকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

(ত) রাজনৈতিক নেতৃত্ব: প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তে দেশে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনুপস্থিত। বর্তমানে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন, তাকে হতে হবে জননন্দিত, বাস্তবসম্মত এবং গতিশীল। প্রচলিত ধারার নেতৃত্ব সর্বোতভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব বর্তমান সময়কে গ্রাস করেছে, তবে এটা স্বল্পস্থায়ী এবং সকলের জন্য ক্ষতিকারক হতে বাধ্য।

(থ) ধর্মীয় সাধক এবং মুসল্লি সম্প্রদায়: এই ভূখণ্ডের জনগণ ধর্মপরায়ণ, কিন্তু তারা মুসল্লিদের নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা মুসল্লিদেরকে মনে করে উগ্র, গোঁড়া এবং অশিক্ষিত। অন্যদিকে, জনগণের ওপর ধর্মীয় সাধকদের রয়েছে প্রচণ্ড প্রভাব। ধর্মীয় সাধকদের প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে, তবে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে এরা তেমন আগ্রহী নয়। বস্তুত বাংলাদেশের জনগণ রাজনীতিতে ডান কিংবা বাম দুটি ধারার কোনোটিরই চূড়ান্ত স্বরূপ দেখতে চায় না। কেন ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং ওলামাগণ এদেশের জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, তা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

(দ) সক্রিয় রাজনৈতিক দল: এদেশে হাতেগোনা তিন/চারটি রাজনৈতিক দল রয়েছে, যেগুলো তৃণমূল পর্যায়ে কমবেশি সংগঠিত এবং রাজনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম। কিন্তু এই দলগুলো ইতোমধ্যে তাদের কৃতকর্মের কারণে বিভিন্ন দিক দিয়ে জনগণ কর্তৃক নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথমত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আওয়ামী

লীগের কথা। এই দলটি নিন্দিত হয়েছে। তার ভারতমুখী অবস্থান এবং ১৯৭২-৭৫ সালে তাদের সাড়ে তিন বছর দুঃশাসনের কারণে। এই দলটি একচ্ছত্রভাবে হিন্দুদের সমর্থন ভোগ করে আসছে। এই দলের প্রতি মুসলমানদের একটা সাধারণ বিতৃষ্ণা-বীতশ্রদ্ধা রয়েছে। ভারতমুখী হিসেবে জনপরিচিত আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে জনগণকে বিশেষ করে ইসলামি শক্তিগুলোকে এই বলে হুমকি দেয় যে, এসব ইসলামভক্ত শক্তিকে শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজনে এদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী ডেকে আনতেও তারা দ্বিধাবোধ করবে না। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জন্য একটা স্থায়ী হুমকিস্বরূপ। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় National Salvation movement- অন্যান্য ইসলামপ্রিয় বিপ্লব শক্তিগুলোকে সাথে নিয়ে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশে একটি 'জিহাদ' সূচনা করার লক্ষে, এটি বর্তমানে অন্যান্য ইসলামি সংগঠনের সাথে সমন্বয় ও পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

(ধ) বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির সম্ভাবনাঃ উপরোল্লিখিত প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে দেশে একটি নতুন নেতৃত্ব তৈরির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের বন্ধ্যাত্ব চলছে দীর্ঘকাল ধরে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বস্তুত তারা একটা অন্তঃসারশূন্যতা বিদ্যমান রেখেছে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই একটা নতুন নেতৃত্বের চাহিদা আজ জনগণের সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। যতদিন অব্দি এরকম একটা বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে না উঠছে, ততদিন সামরিক শাসন তার সমগ্র কর্তৃত্ব নিয়ে রাজনীতিতে বর্তমান ধারার অস্থিতিশীলতা বজায় রেখেই চলবে। কিন্তু উপরোক্ত কাঙ্ক্ষিত বিকল্প নেতৃত্বের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। আর এ কাজটি স্বয়ংক্রিয় বা অলৌকিকভাবে সমাধা হবে না; এক্ষেত্রে পরিকল্পিত কর্মপন্থা অপরিহার্য। সাধারণ ইসলামি শক্তি, বিশেষ করে লাখ লাখ মাদ্রাসা-শিক্ষিত যুবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ইসলামিভাবাপন্ন তরুণরা এযাবতকাল নিষ্ক্রিয়- নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে, যারা দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি, তারা আকস্মিকভাবেই একটি গতিশীল নতুন শক্তিতে রূপ নিতে পারে, যতি তারা যথার্থভাবে সংগঠিত হয়। এই অমিত সম্ভাবনাময় শক্তি মূলত প্রচ্ছন্ন

রাজনৈতিক মনোভাব নিয়ে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা একমাত্র এখানেই লুক্কায়িত বলে আমি মনে করি। রাজনীতিতে নতুন এক প্রকাশভঙ্গি আনতে হবে আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির সংমিশ্রণে, কোনো নির্জীব ইসলামি শক্তির দ্বারস্থ হয়ে নয়। National Salvation movement (জাতীয় মুক্তি আন্দোলন) তার যাত্রা শুরুর প্রাক্কালেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ধারার প্রবর্তন করতে চায় এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যেহেতু আজ রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে মোনাফেকদের হাতে, যারা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে হারামের পথে ধাবিত করে। মরহুম হাফেজ্জী হুজুর তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনে এই অশুভ শক্তিকে তিরোহিত করার প্রয়াস পান এবং লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ তরুণ তার এই পথে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ ও অপ্রতিরোধ্য ইমানি দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আর এদের মাঝেই নিহিত রয়েছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। এবং হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে ইসলামি মুক্তি আন্দোলন এই যুবশক্তিকেই পুনর্গঠিত করে একটি ইসলামি বিপ্লবের পথে তাদেরকে পরিচালিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সংক্ষেপে এই হলো একনজরে বাংলাদেশের জনগণ এবং রাজনীতি। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই দেশটায় মানুষের দায়িত্ববোধ যতটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে তাদের চাহিদা। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানে একটা নতুন মাত্রা সংযোজনের জন্য এই মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন, সেটা হলো আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার একটা ঐক্য। বাংলাদেশের ইসলামি শক্তিগুলোর পুনর্গঠন এখন অত্যাবশ্যক। প্রচলিত নেতৃত্ব প্রায় নিঃশেষিত, নিষ্ফলা, জরাগ্রস্ত। সামরিক শাসন ১২ কোটি মানুষের একটি জাতির জন্য কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে জনগণের ঐক্য এবং সংহতিই ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করতে পারে। দেশের স্থিতিশীলতার জন্য যা হবে স্থায়ী চালিকাশক্তি। এই জাতি বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ দ্বন্দ্বে বিভক্ত। এই অন্তর্দ্বকে অবশ্যই তিরোহিত করতে হবে এবং তাহলেই কেবল একটি নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করতে পারে, যা ইসলামের সাথে আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় সাধন করবে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারবে।

আমলাতন্ত্রের ফাঁদে ওলামা সমাজ

বাংলাদেশের ওলামা-আলেম সমাজ জনগণের আস্থা অর্জনের পথ থেকে এখনো অনেক দূরে অবস্থান করছে। আমাদের ওলামাদের ভূমিকাকে বর্তমানে বিদ্যমান। বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এখন ইতিহাসকে সামনে রেখে আমরা যদি বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাই আটষট্টি হাজার গ্রামবেষ্টিত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল এলাকা, শতাধিক মিলিয়ন মানুষ, যাদের বেশিরভাগ মসজিদ, মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষায় সাধারণভাবে শিক্ষিত। সুস্পষ্টত এদেশের এই জনগণ গভীরভাগে ধর্মপ্রাণ। শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ এখানে মুসলমান। তা সত্ত্বেও দেশটি একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র না হওয়ায় এটি জনগণের ন্যূনতম জীবন-মানসম্পন্ন একটি কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। বরঞ্চ, এক্ষেত্রে আমাদের সামনে দুঃখ-যাতনা ও সমস্যার একটি বিষণ্ণ চিত্র ফুটে ওঠে, দেশের শতকরা ৯৬ ভাগ জনগণ যাতে আক্রান্ত। কেন এমনটি হলো? ইসলামের এত বিপুলসংখ্যক অনুসারী থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের দেশের মানুষ এমন অন্ধকারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সর্বোৎকৃষ্ট জাতি হিসেবে বিচার করে। কুরআনের অনুসারীদের জন্য আল্লাহর অনেক ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের সফলতা ও অগ্রগতির সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করে দিয়েছেন। তারপরও কেন ইসলাম-অনুসারীরা কথিত আধুনিক সভ্যতার দ্বারস্থ? আল্লাহ কি তার পবিত্র গ্রন্থে ভুল ওয়াদা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)? অথবা আমরা কি তথাকথিক মুসলমান হয়ে আমাদের জীবন থেকে কুরআনের শিক্ষা উঠিয়ে দিয়েছি? নিঃসন্দেহে এই শেষোক্ত কথাটিই সত্য। হ্যা, আমরা কোনো ক্ষেত্রেই কোরআনের শিক্ষার প্রকৃত চেতনা ও গতিশীলতার ধারে কাছেও নেই। আমাদের সার্বক্ষণিক দুঃখ-দুর্দশা এবং দারিদ্র্যদশা এটাই বলে দেয় যে, হয় আমরা কুরআনের শিক্ষাকে কখনই উপলব্ধি করতে পারব না, কিংবা হয়তো আমরা সঠিক কাজের স্থলে ক্রমাগত ভুল করার জন্য অর্ধশিক্ষিত থেকে যাবে আর যেকোনো বিষয়ে অর্ধশিক্ষা অশিক্ষার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। আমাদের দেশে ইসলামকে ব্যাপক অশিক্ষা এবং এ অর্ধশিক্ষার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। 'মাওলানা' এবং 'ওলামা' বলে দাবিদার গোষ্ঠীর মধ্যে খুব নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে

পাওয়া যায়, যারা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন আন্তরিকভাবে; কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করা যায় যে, তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের নির্দেশনা প্রয়োগের সাহস হারিয়েছেন। তারা তাদের কর্মে কুরআনের গতিশীলতাকে বর্জন করে চলেন। তারা কেবল নিছক ইসলামি সাধারণ আচার-আচরণ চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নতুবা তারা বিদ্যমান ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনব্যবস্থার ফাঁদে আটকে পড়েছেন বলে মনে হয় এবং যে সূত্রে তারা কথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সরকারের মদদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে চাকরিও করছেন নিতান্ত যন্ত্রের ন্যায়। আমাদের দেশের জনপ্রিয় বা সুপরিচিত ওলামা, পীরসাহেব এবং ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশই মনে হয় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন বিগত এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট সরকারের সুষম পরিকল্পনায় তৈরি পঙ্কিল আবর্তে এবং তারা কেবল এ সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই করছেন না, উপরন্তু গভীর সংকটের মুহূর্তে এই মুনাফেক সরকারকে উদ্ধার করতে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতাও দিয়ে থাকেন। বছরের পর বছর ধরে এই সুপরিচিত মোল্লা, ওলামা এবং ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের এমন আত্মসমর্পণসুলভ ভূমিকা পালিত হয়ে আসছে। তাদের এ রকম আত্মসমর্পণমূলক ভূমিকা দেখা গিয়েছিল ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর পৈশাচিক গণহত্যার সময়ে। স্মর্তব্য যে, একাত্তরের ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতে জনগণের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। হত্যা করে লাখ লাখ পুরুষ-নারী ও শিশুকে, ধর্ষণ করে অর্ধ মিলিয়ন মুসলমান নারী, কিশোরী এবং উঠতি বয়সি বালিকাকে, জ্বালিয়ে দেয় শত শত ঘরবাড়ি এবং হাজার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশু, ভিক্ষুক, বিধবা ও এতিম হয় যুদ্ধকালীন এই নয় মাসে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল সেই অন্যায় আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য। যা বাঙালি জনগণের একটি সর্বাত্মক সংগ্রামে রূপ নেয় প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপুষ্ট আমলাতান্ত্রিক শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে। এ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ। তারা দীর্ঘ নয় মাস প্রাণান্ত লড়াই করেছে। শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য। এটা

ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ছিল না, ছিল না ধর্মনিরপেক্ষতা লাভের যুদ্ধ-এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে 'কুফুরি' 'জালিয়াতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ মস্কোকেন্দ্রিক বামপন্থিদের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে আরোপ করার সুযোগ নেয় এবং তৎপরবর্তীকালে ইসলামি তৎপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এটা ছিল দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের ওলামা সমাজ, অধিকাংশ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, পীর-মাসায়েখ, যারা মজলুম জনগণের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন, তারা সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষে কাজ করেন ইসলাম রক্ষার নাম নিয়ে। নির্দয় গণহত্যা, ধর্ষণ এবং হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষের বাড়িঘরে অতর্কিত অগ্নিসংযোগ, হামলা ইত্যাদি ঘটনা নিশ্চয়ই ইসলামের পক্ষেও নয়, ইসলামকে রক্ষার জন্যও নয়। ওলামা সমাজ এবং ইসলামি দলগুলো কেবল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এ কর্মকাণ্ডকে সমর্থনই যোগায়নি, উপরন্তু তাদেরকে সার্বিক সহায়তাদান ও তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে আধাসামরিক বাহিনীরূপে ব্যবহার করেছিল এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদি মদদপুষ্ট এ তৎপরতাকে ইসলামের পক্ষের কাজ বলে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছিল। কাজেই তাদের এই ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নেতিবাচক। দলগুলো দুঃখজনকভাবে তাদের সাথে ইসলামি নাম ব্যবহার করেছে, যা ব্যাপক সম্মান, মর্যাদা ও ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে ইসলামের সূচনাপর্বে তাদের ত্যাগ, ভোগান্তি ও অবিস্মরণীয় ভূমিকার কারণে।

স্বাভাবিকভাবেই দেশপ্রেমিক যুবসমাজ ও সেইসাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী জনগণ, যারা পাকবাহিনীর পাশবিক তৎপরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, তাদের মনে ওলামা-মওলানা সমাজ ও ইসলামভিত্তিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল এবং এই ইসলামি শক্তিগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এর ফল ভোগ করেছে এবং এজন্য একটা কলঙ্কের অমোচনীয় উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এটা ছিল ইসলামি শক্তির ভাবমূর্তিকে কলুষিত ও নস্যাৎ করার উদ্দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের গড়া একটা পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র; সেহেতু একমাত্র ইসলামই কেবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শয়তানি কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে একটা চ্যালেঞ্জ হতে

পারে। আজ ইসলামি শক্তিগুলো এ ধরনের একটি ধারণার শিকার যে, ঐ সকল ইসলামি নেতৃত্বের পক্ষে জনগণের আস্থা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। আর স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার কারণে এসব বিদ্যমান কথিত ইসলামি নেতৃত্ব বর্তমানে একটা হীনম্মন্যতার জটিলতায় আক্রান্ত এবং ইতিবাচক কোনো ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আড়ষ্টতায় ভুগছে। যার ফলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তিগুলো প্রায় সম্পূর্ণ একচেটিয়াভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র: মূল সমস্যাসমূহ

এছাড়া বিদ্যমান ঐতিহাসিক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার স্বার্থগত ক্ষমতার খেলায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধক এবং ফাস তৈরি করে রেখেছে। এটা সেই আমলাতন্ত্র, যা দেশে খ্রিষ্টীয় মিশনারিদেরকে ইচ্ছেমতো কাজ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কম্যুনিস্ট সমাজবাদী শক্তিগুলোও এদেরকে এমন ইচ্ছে মতোন কাজ করতে দেয়ার পক্ষে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই আমলাতন্ত্র নীতি আদর্শহীন রাজনীতিকদের সহায়তায় বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিবেশী হিন্দুস্তানি তাদের পৌত্তলিক কর্মকাণ্ড চালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এভাবে হিন্দুস্তানকে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন বাংলাদেশের মুসলিম তরুণ সমাজকে বিপথগামী করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

এ হলো ইসলামি আন্দোলনকে অবদমিত রাখার লক্ষ্যে আমলাতন্ত্র সৃষ্ট বাস্তবিক সংকট। আর আমলাতন্ত্র যেভাবে অবস্থান নিয়েছে, তাতে তারা তাদের এ অনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে প্রায় সম্পূর্ণ বিনা চ্যালেঞ্জে এবং কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই।

ওলামাদের নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলন অপরিহার্য

এদেশে বিদ্যমান ইসলামি নেতৃত্ব প্রকৃত অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কোনো গুণাবলিরও অধিকারী হতে পারেনি, পারেনি বাস্তবানুগ প্রয়োজনীয় কোনো পন্থা প্রয়োগ এবং একটি বিপ্লবী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতেও । আবার একটি বিপ্লবী আন্দোলন ফললাভও করতে পারে না ওলামাদের নেতৃত্ব ছাড়া। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিস্থিতি ওলামা সমাজকে দিকনির্দেশ করছে তাদের বিপ্লবী চেতনা ও আত্মোৎসর্গের মানসিকতা নিয়ে গণমানুষের নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্য। এ সমাজ বলতে এদেশের নির্ভেজাল ওলামা-মাসায়েখ, খাঁটি পীর-বুজুর্গ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কথা বলছি। তাদেরকে অবশ্যই এই কর্তব্যকে অনুধাবন ও স্থির করতে হবে এবং ইসলামপ্রেমী যুবসমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং তাদের অনুগামীদেরকে অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে এ ওলামাসমাজকে সমর্থন দেয়ার জন্য। ইসলামি নেতৃত্বকে অবশ্যই হতে হবে ঋজু প্রকৃতির, বলিষ্ঠ ও আপসহীন এবং সম্পূর্ণরূপে তৌহিদী চেতনায় উজ্জীবিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের ওলামা সমাজ এতবেশি আয়েসপ্রেমী যে, তাদের এ শান্তি ও বিলাসপ্রিয়তা কাপুষতারই নামান্তর।

কালেমা তাইয়্যেবা মুসলমানদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ছাড়া সকল প্রকার শিরকি শক্তিকে বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা, অস্বীকার এবং প্রয়োজনে ধ্বংস করার শিক্ষা দেয়। মুনাফেক ও তাগুতি শক্তির বিরোধিতা এবং এক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত রয়েছে। যদি ওলামাদের নতুন নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কুরআনী চেতনা নিয়ে একটা ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনের অবতারণা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তা অন্য সকল রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলনকে অসার করে দিতে পারবে। জাতির আকাঙ্ক্ষা একটি ডানপন্থি নেতৃত্বের এবং সেটা একমাত্র খাঁটি। নিষ্কলুষ ওলামাদের দ্বারা গঠিত হবে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষের ওলামা সমাজ ও যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এরপরই কেবল একটা অপ্রতিবীর্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে, যা এই জমিনে একটি ইসলামি বিপ্লবের সূচনা করতে মোটেই সময় নেবে না। কিন্তু বর্তমান ইসলামি আন্দোলনে কোনো উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধাভাজন বা জনপ্রিয় নেতার উপস্থিতি নেই । এটা হলো সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা এবং এটা

সবচেয়ে বড় মৌলিক সংকট। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিপ্লবী ওলামা সমাজ এবং অন্যান্য বিপ্লবী ইসলামি শক্তিগুলোর সাথে বিদ্যুৎস্পৃহ লড়াকু যুবসমাজের সম্মিলন ঘটানোর মধ্য দিয়ে এ সংকট কাটিয়ে উঠতে দৃঢ় সংকল্প।

বাংলাদেশে পরিচিতি সংকট

এই সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার আলোকে জাতি এক ধরনের পরিচিতি সংকটে নিপতিত হচ্ছে বলা যায়। এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমা শিক্ষার শিক্ষিত ক্ষমতাসীন আমলা এবং সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ, যাদের মতবাদ ও নীতিহীন জীবনদর্শন ধর্মনিরপেক্ষতার পূজারি, তাদের সম্মিলিত তৎপরতায়। বেশিরভাগ আধুনিক শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণি, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, পেশাজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা সমাজবাদী এবং সগোত্রীয় মতবাদীদের জন্য উপযোগী। কেননা, ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক জীবন দর্শনের কোনো নৈতিক ও চেতনাগত বাধ্যবাধকতার বালাই নেই। বরঞ্চ এরা সকল পঙ্কিলতার দ্বারোন্মোচন করে এবং কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই মানুষকে আহ্বান করে জীবনের সস্তা বিনোদনে মত্ত হবার জন্য। আমাদের জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ অংশটি কেবল ধর্মের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ নয়, তারা বীতশ্রদ্ধ সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামের ওপরে। তবে এক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত অহিতকর, মুখে মুখে বাকপটু। আমাদের সচেতন জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সুবিস্তৃত জালে আবদ্ধ। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে মারাত্মক পরিচিতি সংকট এবং এভাবে তারা হারিয়েছে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সৃষ্টিশীলতাবোধ এবং পরিণত হয়েছে সামাজিক পরগাছায়। কিন্তু জাতির সাধারণ জনগণ এবং দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনী গভীরভাবে ইসলামপন্থি। তাদের কোনো পরিচিতি সংকট নেই।

জাতির সচেতন অংশের এ পরিচিতি সংকট আমাদের সাংস্কৃতিক এবং আদর্শিক উন্নয়নের পিছনে এক মারাত্মক বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভীষ্ট জীবনের এ বিচ্ছিন্ন অবস্থা সন্দেহাতীতভাবে সেই বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও দর্শন থেকে উদগত, যা বাংলাদেশে আরোপিত হয়েছে তৌহিদী চেতনাকে

নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে। ধর্মনিরপেক্ষবাদের ধ্বজাধারীদের এ সূক্ষ্ম চ্যালেঞ্জকে পরাস্ত করতে হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংগঠিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে, ইসলামি অর্থনীতি সূচনার একটি কৌশল ও বিপ্লব সাধনের মধ্য দিয়ে। ইসলামি শক্তিগুলো কর্তৃক গৃহীত এ ধরনের সুদৃঢ় ইতিবাচক উদ্যোগকে অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর কঠিন অপপ্রচার প্রতিরোধে সক্ষম হতে হবে। ইসলামি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রাথমিক কাজ হবে বেকারত্বের অভিশাপের বিরুদ্ধে কার্যকর যুদ্ধ শুরু করা এবং যা বিপথগামী হতাশ যুবসমাজকে ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক নিপীড়ন

বাংলাদেশে ইসলামি আন্দোলনের এই সংকট প্রায়শই সদাবর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক দৈন্যদশার ওপর নির্ভরশীল এবং একারণেই এর এমন সঙিনদশা। অর্থনৈতিক দীনতার এ নিগূঢ় কালোমেঘ আমাদের মাথার ওপর অভিশাপের ছায়ারূপ বিস্তৃত ৯ হচ্ছে আমাদের জনগণের ইসলামি অনুভূতিকে নিস্পৃহ করার উদ্দেশ্যে; যাতে তারা যথার্থভাবে ও নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয় খ্রিষ্টীয় মিশনারি, প্রতিবেশী ভারতীয় ব্রাহ্মণগোষ্ঠী এবং কম্যুনিস্টদের হিংস্র অপরাধী চক্রের দ্বারা। এ সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক দীনতাই দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে অনৈতিকতার। এ অনৈতিকতা থেকেই অধঃপতন এবং তা থেকেই অসংলগ্নাবস্থার জন্ম। সাম্রাজ্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদের বেকার যুবসমাজকে সহজে ও দ্বিধাহীনভাবে পশ্চিমা সভ্যতার শিকারে পরিণত করে ফেলেছে। সমগ্র যুবশক্তি নানাভাবে বিভক্ত হয়েছে এবং অনবরত পরিচালিত হচ্ছে দুই পরাশক্তির সরাসরি এবং অসরাসরি প্ররোচণায়। আমাদের সমাজে নৈতিক অধঃপতনের বীজ বপনে ভারতের একটা গুরুতর ভূমিকাও রয়েছে। একশত মিলিয়নের একটা জাতি তিলে তিলে মরে যাচ্ছে আমাদের নাকের ডগায়। এখানে হাজার হাজার মসজিদ- মাদ্রাসা, অসংখ্য মাওলানা-ওলামা, খ্যাতনামা পীর সাহেব এবং ধর্মীয় সাধক রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা বাংলাদেশের এ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে রক্ষা করছেন না। গতানুগতিক ইসলামি

আচারানুষ্ঠান, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য ইসলামি আদর্শের প্রচারসর্বস্ব অবস্থান এই ধস ঠেকানোর জন্য বড়ই ঠুনকো অস্ত্র, যার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানরা বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ইসলামের পক্ষে যথার্থ উচ্চকণ্ঠ তেমন কেউ নেই, নেই ইসলামের স্বার্থে ব্যাগ কোনো উচ্চারণ, যা বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারবে আসন্ন দুর্যোগ থেকে। এক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, তৌহিদী চেতনায় মুসলমানদের ইমানি পুনর্জাগরণ। জিহাদের জন্য মুসলমানদের পুনঃসংগঠিতকরণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ হচ্ছে দ্বিতীয় কর্তব্য এবং কুফরি, শিরক, তাগুতি ও জাহেলিয়াত শক্তিকে ধ্বংস করে কুরআনী শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এই কর্তব্যগুলো সম্পন্ন করা ও চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো ইসলামি বিপ্লবের জন্য একটি সুচিন্তিত কৌশল নির্ধারণ। এ কৌশল হবে যতটা রাজনীতিসংশ্লিষ্ট, ততোটা নিখাদ ও যথার্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনামাফিক। এই দুই যুগপৎ কার্যক্রমের অবশ্যই একটি সর্বজনীন পুনর্গঠন সেল তৈরি ও পরিচালন ক্ষমতা থাকতে হবে। সে পুনর্গঠন সেল হবে ইসলামি বিপ্লবের হাই কমান্ডের মূল গোপনীয় শক্তি।

কৌশল

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিপথগামী ইসলামি শক্তিগুলোকে অবশ্যই সেই 'হাই কমান্ডের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, যারা ইসলামি শাসনতন্ত্রের জন্য কমবেশি কাজ করছে। এই প্লাটফর্মকে অগ্রসর হতে হবে দেশে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে। বিরামহীন তেজস্বী গণআন্দোলনের মাধ্যমে এই প্লাটফর্মকে ইসলামি শাসনতন্ত্রের পক্ষে একটা ব্যাপকভিত্তিক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা উচিত। এই ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন অবশ্যই হতে হবে আমাদের দেশের নিখাদে জনপ্রিয় ওলামার নেতৃত্বে, কথিত একাধিক সদস্যের প্রেসিডিয়ামের নেতৃত্বে নয়। এ ধরনের প্রেসিডিয়াম নেতৃত্ব অস্পষ্ট এবং এরা রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার স্থলে অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবাণু ছড়ায় ব্যক্তিগত অহংবোধের উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে। ইসলামপ্রেমী শক্তি, যারা ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনে শরিক হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেনি, কিন্তু একটা

বিপ্লবী ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাদেরকে গোপনে স্বাধীনভাবে তাদের শক্তিমত্তার উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। যাতে ইসলামপ্রেমী বিপ্লবী যুবশক্তিকে এর সাথে অঙ্গীভূত করা যায়। সময়ের আবর্তনে এখানকার ধর্মনিরপেক্ষ মহল তাদের স্বার্থান্বেষী অভিলাষ এবং তিক্ত ও নিষ্ঠুর ক্ষমতার খেলার প্রভাবে আরো অধঃপতন ডেকে আনবে নিজেরা ক্ষতবিক্ষত হওয়ার জন্য এবং তারপর বিপথগামী লাখ লাখ যুবক ধাবিত হবে বিপ্লবী প্লাটফর্মের দিকে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা এবং উত্তম ভবিষ্যতের জন্য। গোপন ইসলামি বিপ্লবী প্লাটফর্মের উপস্থিতি তখন সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। একটা সময়ের পরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি ও কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানমাত্র। এটি নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এরপরে আসে এর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকটি- যেটি অবশ্যই হবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা কেন্দ্রীভূত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জামায়াতে ইসলামি ছাড়া অন্য কোনো ইসলামি শক্তিরই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি নেই। সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র ঘেঁষা জামায়াতে ইসলামি নিঃসন্দেহে দেশে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে, কিন্তু তারা সেটা করেছে বিরাজমান পুঁজিবাদী আদলে; যেহেত তাদের রাজনৈতিক কৌশল পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ অনুগামী। জামায়াতে ইসলামির রাজনৈতিক ধারা সবসময়েই ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির বাহক; তারা কখনো এর বিরোধিতাও করেনি, পুঁজিবাদী পদ্ধতির সাথে দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হয়নি। সুতরাং তাদের অর্জিত কোনো সাফল্য দেশে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করতে পারেনি। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জামায়াতে ইসলামিকে প্রকৃত অর্থে কেবল অনৈসলামিকই নয়, এক অর্থে যেকোনো ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তির চেয়েও বেশি বিশ্বাসঘাতক বলা চলে। সংক্ষেপে জামায়াত হচ্ছে সৌদি রাজতন্ত্রের বীজ থেকে সৃষ্ট এক অশিষ্ট গোষ্ঠী। অন্যদিকে বাংলাদেশে এ জামায়াতে ইসলামি এবং মাদ্রাসা সংগঠনের নেতৃত্বে ইরাক-কুয়েতভিত্তিক ইসলামি ফ্রন্ট একটি সন্তোষজনক আর্থিক

সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং এ ফ্রন্ট হচ্ছে সরকার সমর্থিত 'ইসলামি আন্দোলন'। এ ফ্রন্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রত্যক্ষ স্বার্থে প্রকৃত ইসলামি আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করা এবং এভাবে বাংলাদেশে যেকোনো প্রকৃত ইসলামি আন্দোলনকে স্যাবাটোজ করা।

বিপ্লবী ইসলামি আন্দোলনের কোনো নিজস্ব আর্থিক পৃষ্ঠপোষক নেই। বাংলাদেশে ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনের যদিও একটা বিরাট সম্ভাবনা বিরাজমান। সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এর অনুকূলে। এখন জরুরি প্রয়োজন হলো বিপ্লবের পথে যাত্রা শুরুর জন্য ঐক্য এবং দৃঢ় সংকল্প।

একটি ইসলামি বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি আবশ্যক

যুগে যুগে দায়িত্ব-কর্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে, কিন্তু একটি ইসলামি বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি গড়ে তোলার জন্য বস্তুত এখন যা প্রয়োজন, তা হলো সমমনা দৃঢ়সংকল্প তেজস্বী মানুষ, যারা আন্তরিক ও একাগ্রভাবে আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গীকৃত। বিপ্লবী নিয়ামক শক্তি গড়ে তোলার পর সেখান থেকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন একক ও যৌথ বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশজ প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তি। এ সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর নীতিতে উত্তরোত্তর আরো বহুমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে বাধিত হবে। যার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি ও প্রণোদনার মাধ্যমে হাজার হাজার বেকার যুবককে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এ ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের চর্চা ও বিস্তৃতি ইসলামি অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে, যেটি সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ কার্যত অবগত নয়।

দ্বিতীয়ত, এ ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি বা তহবিল ইসলাম বিপ্লবী আন্দোলনের অনুকূলে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাপন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রধানত ব্যবহৃত হতে পারে। এ বিপ্লবী নিয়ামক শক্তি প্রয়োজনে ব্যক্তি পর্যায়ে একজন অবিচল ইমাম, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়া একজন নেতাও হতে পারে। এ শক্তিকে অবশ্যই যথার্থভাবে পারঙ্গম হতে হবে যেকোনো ব্যবসায়

বাণিজ্য (ইসলাম অনুমোদিত) প্রকল্প, আন্তর্জাতিক লেনদেন পরিচালনায় এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতৈক্য ও অঙ্গীকার নিয়ে এ বিপ্লবী শক্তিকে একটি ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশে চিরন্তন কুরআনী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে চিহ্নিত ও প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং একদিন যখন বাংলাদেশ ইসলামি দেশ হবে, তখন এটি ভারত, আরাকান (বার্মা) পাটানী (থাইল্যান্ড)-এর নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে একটি কার্যকর সাহায্যকারী ভূমিকা রাখতে পারবে; একই ভূমিকা রাখতে পারবে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের মুসলমানদের জন্যও। একটি ছোটো ভূখণ্ডের ওপর কেন্দ্রীভূত বাংলাদেশের একশত মিলিয়ন মুসলমান সবচেয়ে সুবিধাজনক একটি স্প্রিং বোর্ডের (Spring Board) মতো অবস্থানে রয়েছে ভারতে ইসলামি শাসন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে। যেমনটি ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এটা হলো বাংলাদেশ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তার ঘটানো টিকে থাকার প্রয়াস সবচেয়ে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

উপসংহার

বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। এটা আজকের মিশ্র সভ্যতার একটি অংশ এবং এদেশের জনগণ বিশ্বের প্রায় একশ কোটি মানুষের সাথে তৌহিদের ওপর বিশ্বাসকে আমাদের সর্বজনীন পরিচয় হিসেবে ধারণ করে আছে। সমগ্র বিশ্বের তৌহিদী জনগণ নিজেদেরকে বিবেচনা করে এক দেহ এবং এক আত্মা হিসেবে।

ইসলাম সকল ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ, রক্ত ও সীমানার উর্ধ্বে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি যে, একশত মিলিয়ন মানুষ, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামের অনুসারী, তারা কিছুতেই তাদের বিশ্বাসে কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নিষ্পেষণে মৃত্যুবরণ করতে হলেও আমরা সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর অবধারিত কৃপায় পরিপুষ্ট এবং তার মহত্ত্বকে তুলে ধরতে আমরা বাধ্য। আমরা সবাই ঋণী আল্লাহর কাছে, আমাদের মাতা-পিতার কাছে, আমাদের বিশ্বাসের কাছে এবং সেই সূত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল

ভবিষ্যতের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমরা বাধ্য। বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কালেমা তাইয়্যেবার দাবি এবং এটাই হলো মুক্তির একমাত্র উপায়। প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে গঠিত নিয়ামক শক্তি তার অভিযানে সফল হবে ওলামাদের নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে আধুনিক শিক্ষিত অনুসারী, যেমন আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ প্রমুখের ক্রমাগত সমর্থন নিয়ে। সর্বজনীন অর্থনৈতিক কার্যক্রম শ্রমিক ও কৃষকদেরকেও ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে পারবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিচার করতে গেলে সংক্ষেপে একে হতাশাব্যঞ্জক ও ধ্বংসাত্মক বলা চলে। বর্তমান নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দলটি যেমন, বিরোধী দলও প্রায় ঠিক তেমনই চরিত্রের অধিকারী। সীমাহীন দুর্নীতি, অতৃপ্ত লালসা এবং সকল প্রকার অপকর্মে সহজলিপ্ততা তাদেরকে ইতিহাসের নিকৃষ্ট জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আজকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বেসামরিক আমলা, উচ্চপদস্থ সেনাঅফিসারদের একাংশ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাটুকার রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক এবং তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের একটা বিরাট অংশসহ সকল পরজীবী এলিট শ্রেণির অন্ধত্বের পরিধি এবং ক্ষমতা ও সম্পদলিপ্সা তাদেরকে অমার্জনীয় পাপ ও অপরাধকর্মে নিয়োজিত রেখেছে। এসব অপরাধীকে কেবল কঠোর শাস্তি দেয়াই নয়, তাদের পুঞ্জীভূত সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা দরকার কোনোরূপ সহানুভূতি ছাড়া । দীর্ঘদিন ধরেই এই দেশটা নেতৃত্বহীন ও নির্দেশনাহীন। এখানে কোনো সামাজিক জবাবদিহিতা নেই। এ পরিস্থিতিতে এমনটি যদি চলতেই থাকে, তাহলে শতাধিক মিলিয়ন ইসলাম অনুসারীর মানবিক গুণাবলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। আর তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজটি কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। ইসলামের বিপ্লবী মুসলমানরা তাদের এ অভিযানে বিজয় লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে আল্লাহ রাব্দুল আলামীনের বিশেষ রহমত প্রার্থনা করবে। আজ এ জাতির জন্য প্রয়োজন গতিশীল নেতৃত্ব এবং সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে আমাদের পবিত্র কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরশীল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চিরস্থায়ী উৎস, যাকে বলা হয় সকল সম্পদের সম্পদ। ইজতিহাদ আর ইজমার মাধ্যমে কুরআন অধ্যয়ন

ও তার বাস্তবায়ন মুসলমানদের জন্য বিরাজমান সমস্যা সমাধানেই কেবল সহায়ক হবে না, এটা তাদেরকে সম্মানজনক নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে নিশ্চিতভাবে। কুরআনের আইনে অমুসলিমদের জান-মাল ও মানমর্যাদা পবিত্র আমানতরূপে রক্ষিত হবে এবং তারা হবেন নিরাপত্তা ও গৌরবের অধিকারী।

এখানে এটা গর্বের সাথে উচ্চারণ করা যায় যে, আজকের ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দূরীকরণ এবং তাদের মাটি থেকে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসরণে মাধ্যমে। ইরানে শাহের স্বৈরশাসনের অবসান এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব কুরআনের অলঙ্ঘনীয় গতিশীলতারই

নেতৃত্বে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ইরানের এই ইসলামি বিপ্লব বর্তমান বিশ্বের একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর প্রেরণাপ্রসূত ধর্নাধারারই অংশ। আজ সমগ্র বিশ্বের অসহায় মুসলমান সমাজ ইসলামি ইরানের বীর জনগণের এ গৌরবজনক সাফল্যগাথার অংশীদার। ইরানে ইসলাম। অনুসারীদের এমন গৌরবের বিজয়ে ঈর্ষান্বিত ও ভীত হয়ে ইহুদি, সাম্রাজ্যবাদী, রাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা একজোট হতো ইসলামি বিপ্লব প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি অন্যায়, দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো ইরানের বিপ্লবী জনগণের ওপর। ইসলামের শত্রুদের সকল পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ইসলামের অকুতোভয় সৈনিকরা বলিষ্ঠভাবে মোকাবিলা করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিধ্বনিত একটি বার্তা হচ্ছে– *শেখো, শেখো এবং শেখো।* সুতরাং আমরা মুসলমানরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করব আমাদের কর্মসম্পাদনের জন্য, আমাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য, দুঃশাসন প্রতিরোধের জন্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ শ্রদ্ধায় আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য এবং শিক্ষা অর্জন করব একমাত্র আল্লাহর প্রতি আমাদের মস্তক অবনত করার জন্য, অন্য কোনো শক্তির কাছে নয়। বাংলাদেশের ইসলামি বিপ্লবীদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে সাহসী লিবীয়দের কাছ থেকে, যারা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফীর তেজস্বী ও সুদক্ষ নেতৃত্বে মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছে কুরআনের

গতিময় শক্তির সাহায্যে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিতভাবে তৃতীয় বিশ্বের সকল নির্যাতিত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে সহায়ক হবে। এশিয়ার সমস্যাসংকুল দেশগুলোতে বিপ্লবের কাজে আর্থিক সংস্থানের অভাব একটি পরিতাপের বিষয় এবং এ সমস্যাটিরও সমাধান হতে পারে সুবিবেচনাপ্রসূত, বিচক্ষণ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এবং আমাদের এ অভিযানের চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য আমরা নির্ভরশীল আল্লাহর করুণা ও সাহায্যের ওপর।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন, পথনির্দেশ করুন শিক্ষা অর্জন করতে এবং সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে; যা ইরানের বিপ্লবের মাধ্যমে কিছুটা হলেও অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের নিজ পরিচয়, অস্তিত্ব ও মুক্তি অন্বেষণে ব্রতী করে তুলুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

স্বাধীনতা লাভের প্রায় ১৭ বছর পরেও আমাদের কোন অভাব দূরত্ব হলোই না, বরং যত দিন যাচ্ছে ততই যেন জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ছি, নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। বুক ভরা আশা স্বপ্ন আজ রূপান্তরিত হয়েছে গ্লানি ও হতাশায়। সম্মান, জাতীয়তাবো মর্যাদাবোধ, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ এসব কিছুই যেন বিধ্বস্ত । এক কথায় বিবেক আজ বিভ্রান্ত সুবিধাবাদ এবং অযোগ্যতার মহারায় গোটা জাতি আজ নিরব নিশ্চল অসহায় জিম্মী।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস
জানতে ভিজিট করুন...

www.sottoprokash.com

সত্য প্রকাশ

সত্য প্রকাশ